উন্নয়নের রথ ও দুর্নীতি-বিরোধী আন্দোলন

সোমনাথ গুহ

যে ভাবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা অকুতোভয় মানুষ এবং তথ্য অধিকার আইনের (RTI) কর্মীদের টপাটপ মেরে দেওয়া হচ্ছে তাতে এ দেশে আইনের শাসন সম্পর্কে সংশয় জাগে। এটা নিছকই কাকতালীয় যে ১৬ আগস্ট সকালে যখন আন্না হাজারের গ্রেফতার নিয়ে দিল্লিতে তুলকালাম চলছে, তখন ভোপালে 'ইন্ডিয়া এগেনস্ট কোরাপশন'-এর নেত্রী, RTI কর্মী শেহলা মাসুদ তাঁর বাড়ির সামনে গাড়িতে বসে আততায়ীর গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছেন। শেহলা ঘুঘুর বাসায় হাত দিয়ে ফেলেছিলেন। খবরে প্রকাশ, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য কাজ করা এই কর্মী একটি চোরাশিকারীর চক্রের হদিস পেয়ে গিয়েছিলেন। অন্য সূত্র বলছে, মধ্যপ্রদেশের দুওরপুর জেলায় একটি বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার ডায়মন্ড মাইনিং প্রজেক্টে তিনি অবৈধ কাজকর্মের হদিস পেয়েছিলেন। ইতিমধ্যেই হত্যাকান্ডকে ঘিরে এক বিজেপি সাংসদের নাম উঠে এসেছে। কংগ্রেস সিবিআই তদন্ত দাবি করেছে।

এ কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। গত বছরের জুলাই মাসে অমিত ঝেতওয়া নামে আর এক RTI কর্মীকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তিনি গির অরণ্যে অবৈধ খননের বিরুদ্ধেপ্রতিবাদ সংঘটিত করেছিলেন। সেখানেও তদন্তে এক বিজেপি সাংসদের নাম উঠে এসেছে। তারও আগে জানুয়ারিতে মুম্বাই-পুনে হাইওয়েতে তেলগাঁও অঞ্চলে জমি কেলেঙ্কারি উদ্‌ঘাটিত করার জন্য সতীশ শেট্টি নামে আরেক কর্মী প্রাণ হারিয়েছিলেন। স্বামী নিগামানন্দ কোনও সমাজ কর্মী ছিলেন না, নিছকই এক সাধু। গঙ্গাবক্ষে অবৈধ খননের বিরুদ্ধে অনশন চলাকালীন পুরো পর্যায়টা জুড়ে তিনি সবার অগোচরেই রয়ে গেলেন। মৃত্যুর পর শোরগোল হওয়াতে সিবিআই এক ডাক্তার (স্বামী যাঁর চিকিৎসাধীন ছিলেন) ও খাদানের মালিককে চার্জশিট দিয়েছে। আরেক বিজেপি শাসিত রাজ্য ছত্রিশগড় তো পুলিশ রাজ্যে পরিণত হয়েছে। রায়গড় শহরে জিন্দালদের ইস্পাত কারখানার দরুণ বাস্তুচ্যুত মানুষের পক্ষে এবং দূষণের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ বছরের রমেশ আগরওয়াল বেশ কিছুদিন ধরেই প্রতিবাদ করে আসছিলেন। ওনার প্রতিবাদের ফলস্বরূপ নিকটবর্তী তামনারে জিন্দালদের একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ওপর পরিবেশ মন্ত্রক বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে। রমেশ আগরওয়াল গ্রেফতার হন এবং অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওনাকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় যেখানে বিছানার পায়ার সাথে তাঁকে শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হয়।

ঘটনাগুলির মধ্যে কি কোনও মিল পাওয়া যাচ্ছে। বিবাদ, হয় জমি নিয়ে নয় অবৈধ খনন নিয়ে। আসলে গোটা দেশ জুড়ে, বিশেষত উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে, উন্নয়নের ধূম পড়ে গেছে। এই উন্নয়ন কাউকে রেওয়াত করছে না। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যাচ্ছে। খনিজ সম্পদ লুট হয়ে যাচ্ছে। প্রতিবাদী কর্মী সংগঠকরা বেওয়ারিশ লাশে পরিণত হচ্ছে। ধন্ধ লাগে, সমাজকর্মীদের জন্য এ এক অসম লড়াই। গঙ্গাবক্ষে খনন বন্ধ করার জন্য কেন্দ্রের পরিবেশ মন্ত্রক থেকে উত্তরাঞ্চল সরকারকে বারবার আদেশ দেওয়া হয়, কিন্তু খনন বন্ধ হয় না। তৎকালীন পরিবেশ মন্ত্রী জয়রাম রমেশ (যিনি এখন গ্রামোন্নয়ের দায়িত্বে) নিরুপায় হয়ে স্বীকার করেন যে মাইনিং লবি এতটাই শক্তিশালী যে রাজ্য সরকার তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না। পরিবেশ মন্ত্রকের আদেশে বিরক্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উল্টোহুঙ্কার দেন— যদি রাজ্যে উন্নয়ন (পড়ুন গঙ্গাবক্ষে খনন) বন্ধ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে রাজ্যের যুবকরা উত্তর-পূর্বের মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলবে। লক্ষ করুন, উন্নয়নের নামে প্রাকৃতিক সম্পদের লুণ্ঠনের বিরোধিতা যারা করবে তাদের দেশদ্রোহীর সমার্থক করে তোলা হচ্ছে।

উঁচু জায়গায় দুর্নীতিজাত বিশাল অঙ্কের টাকা দেশে ফিরে আসছে। এই টাকা নির্বাচনে রাজনৈতিক দলগুলির লাগামছাড়া খরচ জোগায়। জনপ্রতিনিধি কেনাবেচা করে বিভিন্ন সরকার টিকিয়ে রাখে। বিভিন্ন ব্যবসায় বিনিয়োগ হয় এবং যেহেতু জমি নিয়ে ব্যবসা আজ সবচেয়ে লাভজনক এবং রিয়েল এস্টেটে মুনাফার হার সর্বাধিক তাই দুর্নীতিলব্ধ টাকার বড় অংশ ওই ব্যবসায় বিনিয়োগ হয়। তাই এই বেআইনি অর্থ-তাড়িত উন্নয়নের বিরুদ্ধে যখন কেউ প্রতিবাদ করে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়।

মহারাষ্ট্র, ভাট্টা-পারসোল বা গুয়াহাটির মানুষ যখন উচ্ছেদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়, তাদের পুলিশের গুলিতে মরতে হয়। প্রচুর লগ্নি জড়িয়ে আছে এই ব্যবসায়, যাকে বলে too much at stake —কোনও অবস্থাতেই এই উন্নয়নের বিরোধিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই উন্নয়ন চালিত করছে পিপিপি মডেল— পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ। তাদের ঘোষিত লক্ষ্য পরিকাঠামো তৈরি করা— রাস্তা, জল, বিদ্যুৎ, বিমানবন্দর ইত্যাদি। ক্রমবর্ধমান জনস্ফীতির কারণে রাজধানী দিল্লির উপকণ্ঠ বেড়েই চলেছে। তৈরি হয়েছে NCR (ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন)। গাজিয়াবাদ, নয়ডা, গুরগাঁও, গ্রেটার নয়ডা— একের পর একগ্রাম, তহশিল নগরায়ণের গহ্বরে হাপিস হয়ে যাচ্ছে। শহুরে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্তকে স্থান দিতে গ্রামের কৃষিজীবীদের অস্তিত্ব লোপাট হয়ে যাচ্ছে। সারা পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ জুড়ে উন্নয়নের দক্ষযজ্ঞ কেন্দ্রীভূত হচ্ছে ঝাঁ-চকচকেরাস্তা, আবাসন এবং বিনোদন প্রকল্প গড়ে তোলার ওপর। গ্রেটার নয়ডা থেকে আগ্রা পর্যন্ত যে যমুনা এক্সপ্রেসওয়ে গড়ে তোলা হচ্ছে, যা দুটি জায়গার মধ্যে যাতায়াতের সময় চার ঘন্টা থেকে দুঘন্টায় কমিয়ে আনবে, তার জন্য ৪৪,০০০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা আছে যার মধ্যে মাত্র ৯.৩ শতাংশ এই বহু লেন বিশিষ্ট অত্যাধুনিক রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত হবে। বাকিটা বিভিন্ন সংস্থার কাছে বেচে দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা আবাসন, মল, মাল্টিপ্লেক্স, ফুড কোর্ট, স্টেডিয়াম এবং একটি ফরমুলা ওয়ান করা রেসিংয়ের ট্র্যাক গড়ে তুলবে। মনে রাখতে হবে, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ অর্থকরী ফসলের ভান্ডার। এই প্রকল্পের ফলে গ্রেটার নয়ডা এবং আগ্রার মধ্যবর্তী ৮৫০টি গ্রামের প্রায় ১৪ লক্ষ মানুষের জীবন নানাভাবে প্রভাবিত হবে। সারা রাজ্য জুড়ে এরকম আটটি মহাসড়ক গড়ে তোলা পরিকল্পনা আছে যার মধ্যে আছে বালিয়া থেকে গ্রেটার নয়ডা ১০৪৭ কিমি ব্যাপৃত গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ে যার জন্য ২৬.৩৭৪ হেক্টর জমি অধিগৃহীত হবে। রাস্তা তৈরির নামে জমি লুটের এই ব্যবসা অতীতেও ঘটেছে। বেঙ্গালুরু থেকে মহীশূরের মধ্যেকার হাইওয়ে তৈরির জন্য যে পরিমাণ জমি নেওয়া হয়েছিল তার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ ঐ বিশেষ কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। এছাড়াও আছে সমস্ত প্রকল্পের শিরোমণি— দিল্লি-মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল করিডর— ১৪৮৩ কিমি ব্যাপী এক বৃহৎ প্রকল্প যা দুটি রাজ্যের মধ্যে দিয়ে যাবে, যার ১২ শতাংশ পড়বে উত্তরপ্রদেশে। এই প্রকল্প এখনও পরিকল্পনার স্তরে রয়েছে।

ছকটা ইমিধ্যে সুপরিচিত। এই সব অত্যাধুনিক রাস্তা নির্মাণের জন্য সরকারি বা আধা-সরকারি সংস্থা কোনও বড় কোম্পানিকে বরাত দেয়। প্রয়োজনের অনুপাতে অনেক বেশি জমি দেওয়া হয় তাদের যাতে মল, হোটেল, আবাসন ইত্যাদি গড়ে তুলে তার রাস্তা তৈরির খরচটা তুলে নেয় এবং বলা বাহুল্য, বিশাল মুনাফাও করে। এই উন্নয়ন পুরোপুরি আবাসন, মল-মাল্টিপ্লেক্স কেন্দ্রিক, শিল্পের

প্রায় কোনও গল্পই নেই। গ্রেটার নয়ডা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অথরিটি ২০২১ এর মধ্যে ২১,৫৭০ হেক্টর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা করেছে। লক্ষণীয়, এর মধ্যে মোটে ৪২২৭ হেক্টর শিল্প তৈরিতে ব্যবহৃত হবে। নয়ডায় জমি-ফ্ল্যাটের দাম আকাশছোঁয়া, কিন্তু ক্রেতার অভাব নেই। কৃষক এখানে বর্গ মিটার প্রতি দাম পাচ্ছে ৮০০ টাকা যা ডেভেলপারদের কাছে দশ গুণ বেশি দামে বিক্রি হচ্ছে। একটি অ্যাপার্টমেন্টের বিক্রয়মূল্য প্রতি বর্গ মিটারে ৩৫,০০০ টাকা। ডেভেলপারদের লাভের হাত এতটাই যে তারা বলছে, ১৭৬ হেক্টরের ওপর সুপ্রিম কোর্টের নিষেধাজ্ঞার ফলে যে ক্ষত তাদের হয়েছে তা তারা সহজেই অন্যপ্রকল্প থেকে পুষিয়ে নেবে। বলার অপেক্ষা রাখে না, কৃষি জমি বাণিজ্যিক জমিতে পরিবর্তিত করার ফলে মূল্যের যে ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটছে তার ছিটেফোঁটাও কৃষকরা পাচ্ছে না। এছাড়া জনস্বার্থের ধারা প্রয়োগ করে জমি হস্তান্তর তো চলছেই।

একই গল্প মহারাষ্ট্র, অসম ও মেঘালয়ে। মহারাষ্ট্রে সম্প্রতি চারজন কৃষক পুলিশের গুলিতে মারা গেছে। গুয়াহাটি সন্নিহিত পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী জনজাতি এবং অন্যান্য মানুষদের নির্বাচনের আগে পাট্টা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। ভোটের পর উচ্ছেদ শুরু হয়ে গেল। ২২ জুন অখিল গগৈর নেতৃত্বে 'কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি' প্রতিবাদ সংগঠিত করে। পুলিশের গুলি চলে, তিনজন মারা যায়। মনে রাখা দরকার, গত কয়েক বছর ধরে 'কে এম এস এস' বৃহৎ নদী বাঁধের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই আন্দোলনের জেরে জাহাজ ভর্তি টারবাইন যা নদী বাঁধ নির্মাণের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল তাও এক সময় ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিল; অবার নতুন উদ্যমে ঐ প্রকল্প শুরু করার প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে যা বিশেষজ্ঞদের মতে অসম ও পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির জলসম্পদ বৃহৎ কর্পোরেটদের হাতে তুলে দেবে। অখিল গগৈ-এর মতে, এই জলবিদ্যুৎ লবি এতটাই শক্তিশালী যে পার্শ্ববর্তী রাজ্য অরুণাচল প্রদেশে মুখ্যমন্ত্রী পরিবর্তনেও তারা নির্ধারক ভূমিকা পালন করে। মেঘালয়ের শিলং ও গারো হিলসে লাগামছাড়া পাথর খনন শুরু যে পরিবেশ বিপন্ন করেছে তাই নয়, স্থানীয় জনজাতিদের সাবেকি জীবনযাপনকেও প্রভাবিত করছে। এখানকার লাইম ও কোয়ার্টাজ স্টোন অসমের গোয়ালপাড়া হয়ে বিভিন্ন রাজ্যে চলে যাচ্ছে সেই একই নির্মাণ শিল্পের যোগান দিতে।

ওড়িশায় পস্কো বিরোধী আন্দোলন বিভিন্ন স্তরে রয়েছে। কোথাও চাষিরা ক্ষতিপূরণ নিয়ে জমি দিতে সম্মতি দিয়েছে যার ফলে প্রকল্পের কাজ কিছুটা শুরু হয়েছে। কোথাও অধিক ক্ষতিপূরণের জন্য নতুন করে আন্দোলন হচ্ছে এবং পরিবেশ মন্ত্রকের সবুজ সংকেত সত্ত্বেও কাজ এগোচ্ছে না। মনে রাখতে হবে, ছয় বছর ধরে স্থানীয় মানুষ এই লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। সুন্দরগড় জেলায় খণ্ডহার পাহাড়ে পস্কোর প্রস্তাবিত আকর লোহা কারখানা নির্মাণের ব্যাপারে আদিবাসীরা খড়গহস্ত। তারা মনে করে এই পাহাড়ে যে কোনও ধরনের খনন বন ধ্বংস করবে এবং জলের উৎসকে দূষিত করবে। এছাড়াও এই পাহাড় তাদের কাছে পবিত্র। তাদের ধর্মীয় সংস্কার, রীতিনীতি সব কিছুরই উৎস এই পাহাড়। উড়িষ্যায় এই ধরনের আন্দোলনের ঐতিহ্য আছে। আশির দশকে অত্যন্ত উর্বর পানচাষের ভাণ্ডার বালিয়াপালে ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র গড়ে তোলার তারা বিরোধিতা করেছিল এই দীর্ঘ লড়াইয়ের পর তা রুখে দিয়েছিল। সেই প্রকল্প পরবর্তীকালে চাঁদিপুরের নির্জন সৈকতে স্থানান্তরিত হয়। উর্বর জমি দখল না করেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প যে বিকল্প জায়গায় বাস্তবায়িত হতে পারে, এটি তার একটি দৃষ্টান্ত বিশেষ।

সারা দেশ জুড়ে জমি নিয়ে এই ফাটকাবাজি এবং নির্মাণ শিল্পে বিস্ফোরণের কারণে যে প্রশ্নটা সবার আগে উত্থাপিত হওয়া উচিত ছিল তা হল কার স্বার্থে এই উন্নয়ন? সত্তর ও আশির দশকে এই প্রশ্নটা বারবার উঠেছে, বিশেষ করে মেধা পাটকারের নেতৃত্বে সর্দার সরোবর আন্দোলনের সময়। কালে কালে উন্নয়ন নিয়ে এই বির্তক থিতিয়ে গেছে এবং আজ তা পুরোপুরিই ক্ষতিপূরণ কেন্দ্রিক তর্কে পর্যবসিত হয়েছে— জমির মূল্য বাজার দরে পাওয়া যাবে কিনা, চাষি চাকরি পাবে কিনা, নতুন প্রকল্পে তার অংশীদারিত্ব থাকবে কিনা ইত্যাদি প্রশ্নে আলোচনা সীমাবদ্ধ হয়ে গেছে। এটা আজকের উন্নয়নওয়ালাদের একটা বিরাট সাফল্য। একটি পুঁজি-নিবিড় শিল্পেও কিছু কর্মসংস্থান ঘটে, কিছু দক্ষ-অদক্ষ শ্রমিক কাজ পায়, সেই কারখানাকে কেন্দ্র করে আরও কিছু মানুষ জীবিকা অর্জন করতে পারে, কিন্তু এই মল মাল্টিপ্লেক্স কেন্দ্রিক উন্নয়নে কাজ বলতে দারোয়ান, লিফ্টম্যান, মালি, ঝি-চাকর—যা মূলত ঠিকে কাজ। এক কৃষক যে বংশ পরম্পরায় নিজের জমি চাষ করেছে, কয়েক প্রজন্ম যে জমির বাবুদের ফাই ফরমাস খাটার কাজের লোকে পরিণত হবে।

বিভিন্ন প্রকল্পে সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে উত্তরপ্রদেশ সরকার গত সেপ্টেম্বরে একটি উন্নততর ক্ষতিপূরণের প্রস্তাব সামনে নিয়ে আসে। এতে পরিবার পিছু একজনকে চাকরির প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যাতে তারা পাঁচ বছরে ১, ৮৫.০০০ টামা মাইনে পাবে। অর্থাৎ, মাসে ৩০০০ টাকা— ঐ টাকায় দারোয়ানি বা মালিগিরি ছাড়া আর কী হয়? রাহুল গান্ধী তাঁর পদযাত্রায় এমন একজন কৃষক পাননি যে উন্নয়ন চায় না। সত্যিই তো, পৃথিবীতে এমন কেউ কি আছে যে উন্নয়ন চায় না। তিনি এমন কোনও কৃষকও পাননি যে তাঁকে বলেছে যে জমি তো সারা জীবন শুধু চাষই করেছি, অন্য কোনও কাজ তো আমার জানা নেই। এই সময়ের যাবতীয় পত্র-পত্রিকা, নেটের বিভিন্ন নিউজ পোর্টাল একটু ঘাঁটাঘাঁটি করলেই কিন্তু বহু কৃষকের এই কাতর জিজ্ঞাসার সম্মুখীন হতে হয়। এটা অবশ্য আশা করা যায় না যে রাহুল গান্ধী উন্নয়নের এই মডেলের বিরোধিতা করবেন। তিনি পার্শ্ববর্তী কংগ্রেস শাসিত রাজ্য হরিয়ানার উদাহরণ টেনে বলেছেন, ওখানে চাষিরা ভালো দাম পাচ্ছে, চাকরি পাচ্ছে, সরকার তাদের দেখভাল করছে, এখানে সরকার (উত্তরপ্রদেশ) তাদের ওপর গুলি চালাচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্ট বিশেষ অনুচ্ছেদের প্রয়োগ ঘটিয়ে চাষিদের জমি কেড়ে নেওয়ার তীব্র নিন্দা করেছে এবং তা ফেরত দেওয়ার আদেশ দিয়েছে। এটা অনস্বীকার্য যে ইদানীংকালে বিভিন্ন সরকার ও পুলিশ প্রশাসন যখন সমস্ত অবৈধ কাজকর্মে ইন্ধন জুগিয়েছে বা সহায়তা করেছে তখন সুপ্রিম কোর্টেই নানাভাবে এদের বিরোধিতা করেছে। কালো টাকা নিয়ে বিশেষ তদন্তকারী টিম, সালোয়া জুডুমকে পুনরায় অসাংবিধানিক ঘোষণা করা বা ২০০৮ সালের আস্থা ভোটে ভোট বেচাকেনা নিয়ে তদন্তের খোঁজ খবর করা যার ফলে অমর সিংকে চার্জশিট করা হয়েছে— এসবই উচ্চতম আদালতে প্রতিচ্ছবি জনমানসে আরও উজ্জ্বল করেছে। কিন্তু গ্রেটার নয়ডার ১৭৬ হেক্টর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত আদেশটি আদপে সিন্দুতে বিন্দু। স্বয়ং রাহুল গান্ধীর কথাতেই, উত্তরপ্রদেশে যে হারে জমি অধিগৃহীত হয়েছে বা হওয়ার পরিকল্পনা আছে তা অভূতপূর্ব। এছাড়া সুপ্রিম কোর্টের যে কোনও আদেশ কার্যকরী করারও ব্যাপার থাকে। ছত্রিশগড়ে সরকারের মদতেই সালওয়া জুডুম বা কোয়া কম্যান্ড এবং স্পেশ্যাল প্রোটেকশন অফিসার মাওবাদীদের রুখবার জন্য তৈরি হয়। সুপ্রিম কোর্টের আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্র এই রাজ্যের সাথে বৈঠক করেছে এই ব্যবস্থার পুনর্বিবেচনার জন্য। পশ্চিমবাংলা বা বিহারে আমরা সালওয়া জুডুম দেখিনি, কিন্তু হার্মাদ দেখেছি, বিহারে রণবীর সেনা বা লোহিত সেনা দেখেছি যারা নকশালদের মোকাবিলার জন্য তৈরি হয়েছিল। কোনও সরকারই এদের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি; এরা আনঅফিসিয়াল সালওয়ার জুডুম। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের

এদের ক্ষেত্রে কিছু করার নেই। তদের আদেশের যে স্পিরিটটা, যে কোনও দলের হিংসাত্মক কার্যকলাপ রুখবার জন্য তুমি নাগরিকদের নিয়ে পাল্টা কোনও সশস্ত্র বাহিনী গঠন করতে পার না— এটা কে লাগু করবে?

সুপ্রিম কোর্ট আদেশ দিল এফসিআই গোডাউনে পড়ে থাকা খাদ্যশস্য পিছিয়ে থাকা জেলার গরিব মানুষদের মধ্যে বিলি করতে হবে। ফলে, একটি জেলায় গরিম মানুষ চাল পায় এবং বাজারে চালের বিক্রি কমে যায়, এতে ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। এফসিআই -রে কর্মচারীদের হাত করে তারা চাল নিজেদের দোকানে নিয়ে আসে। যে জিনিস তাদের মুফতে পাওয়ার কথা, সেই একই চাল নিরুপায় মানুষ দোকান থেকে কিনতে বাধ্য হয়। তুষার কাঞ্জিলাল এমনি এমনি বলছেন না যে উন্নয়ন বা কোনও সরকারি আদেশ বা আইনের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্যও আন্দোলন দরকার। এই অতন্দ্রপ্রহরী কে হবে? সরকারি বা আধা-সরকারি কর্মী বা আধিকারিকরা এ কাজ করতে পারত কিন্তু তারা তো অধিকাংশই দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। দুর্ভাগ্যজনকভাবে বেশিরভাগ রাজনৈতিক দলের কর্মীবাহিনীও তাই। বামপন্থী দলগুলি নিজেদের সমর্থকদের সুবিধা প্রদান করা ছাড়া আর কিছু ভাবে না। তাই রাষ্ট্রে সদিচ্ছা থাকলেও এই ব্যবস্থার পরিবর্তন অধরাই থেকে যায়।

বহু টালবাহানার পর আগামী শীতকালীন অধিবেশনেই হয়তো জমি অধিগ্রহণ বিল অনুমোদিত হবে। এই আইন ভারতবর্ষের কৃষকদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে। আপাতত যা জানা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় আইন ছাড়াও প্রতিটি রাজ্য তাদের নিজেদের রাজ্যের অবস্থা অনুযায়ী পৃথক আইন প্রণয়ন করতে পারবে। ধরা যাক পশ্চিমবঙ্গ সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জমি আধিগ্রহণে সরকার নিরপেক্ষ থাকবে, কোনভাবেই নাক গলাবেন না। উদ্যোগপতিকে সরাসরি কৃষকের থেকে জমি কিনতে হবে। দ্বিতীয়ত, কোনও অবস্থাতেই বহু ফসলি জমি অধিগ্রহণ করা চলবে না। তৃতীয়ত, যে ধারাটি বহু অপব্যবহার হয়েছে সেই 'জনস্বার্থ'-র ধারা কেবলমাত্র জাতীয় নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে। রাস্তাঘাট, বিমানবন্দর প্রভৃতি নির্মামের অজুহাত দিয়ে এই ধারা যত্রতত্র ব্যবহার করা চলবে না। চতুর্থত, যে উদ্দেশে জমি অধিগ্রহণ হবে সেই কাজের জন্যই তা ব্যবহার করতে হবে। শিল্প করব বলে আবাসন করা চলবে না, যা উত্তরপ্রদেশে আকছার ঘটছ। পঞ্চমত, দশ বছরের বেশি জমি ফেলে রাখলে তা রাজ্যের জমি ব্যাঙ্কে চলে যাবে। এগুলি সবই ইতিবাচক পদক্ষেপ। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় আইনে কিন্তু জেনে বুঝে অনেক ফাঁক ও 'যদি', 'কিন্তু' রেখে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমত, সরকারের ভূমিকা আলাদা আলাদা রাজ্য সরকারগুলিই নির্ধারণ করবে। রাজ্যের পরিস্থিতি অনুযায়ী সরকার নিরপেক্ষও থাকতে পারে আবার সরকারের দায়িত্বেই অধিগ্রহণ হতে পারে। যা একেবারেই মেনে নেওয়া যায় না তা হল, 'জনস্বার্থে'র ধারায় আবারও ব্যক্তি-মালিকানাধীন শিল্পকে অন্তর্ভুক্ত করা; শুধুমাত্র যে জমি অধিগ্রহণ করা হবে তা আশি শতাংশ কৃষকের এতে সায় থাকতে হবে। আগের মতো এই ধারা অপব্যবহারের সুযোগ থেকেই গেল। একইভাবে বহু ফসলি জমির ক্ষেত্রে কোনও জেলার পাঁচ শতাংশ পর্যন্ত ঐ ধরনের জমি নেওয়া যাবে। এটা বাস্তবে প্রয়োগ অসম্ভব। এই তিনটি বিষয়ই শুধু কৃষক-স্বার্থবিরোধী নয়, খাদ্যের জোগানকেও অনিশ্চিত করবে।

আন্নাহাজারের আন্দোলন বারো দিন ব্যাপী অনশন আন্দোলনের শেষে আন্না হাজারে অন্যান্য বিষয়কেও তার ভবিষ্যতের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে নির্বাচনী সংস্কার আছে যা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু একটি পূর্ণাঙ্গ, কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল জমি অধিগ্রহণ আইন কেন্দ্রে এবং বিভিন্ন রাজ্যে দরকার। কৃষক সমাজকে বাঁচানোর সেটাই একমাত্র রক্ষাকবচ। এই ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্তগুলি দিক্ নির্দেশকারী হওয়া উচিত। এই ব্যাপারে নাগরিক সমাজেরও সোচ্চার হওয়া উচিত। এটা ভাবতে অবাক লাগে, আন্না হাজারের আন্দোলন যেখানে সামাজিক সাইটগুলিতে প্রতিবাদের ঢেউ তোলে, 'ইন্ডিয়া এগেনস্ট কোরাপশন'-এর ফোনে লক্ষ মানুষ সমর্থন জ্ঞাপন করেন, সেখানে ভাট্টা - পারসোলে কৃষকের মৃত্যু বা স্বামী নিগমানন্দের জীবনাবসান ফেসবুকে কোনও আলোড়ন ফেলে না। এরকম একটা মনোভাব কি তৈরি হচ্ছে যে দুর্নীতি - বিরোধী লড়াইটা ইন্ডিয়ার আর কৃষকদের লড়াইটা ভারতের?

এছাড়া আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ দাবি আছে যা নিয়ে কোনও রাজনৈতিক দল সোচ্চার নয়। যেমন, শতাব্দী প্রাচীন রাষ্ট্রদ্রোহী আইন যার আওতায় বহু মানুষ, বিশেষ করে ছত্তিশগড়েকারারুদ্ধ হয়ে আছে। 'পিপলস ইউনিয়ন ফর সিভিল লিবার্টিজ' এই আইন বাতিলের দাবিতে সই -সংগ্রহ অভিযান শুরু করেছে। 'আর্মড ফোর্সেস স্পেশ্যাল পাওয়ার অ্যাক্ট' যা বাতিলের দাবিতে মণিপুরে ইরম শর্মিলা এগারো বছর ধরে অনশন করছেন, এর সমর্থনে NAPM -এর নেতৃত্ব ২ অক্টোবর থেকে আন্দোলন শুরু করেছে।

এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে দেশের উত্তর-পূর্ব অংশেও যে অঞ্চল সাধারণত 'মেনল্যান্ড' -এর কোনও আন্দোলনে নিস্পৃহ থাকে, দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন ভালো সাড়া ফেলেছে। মিজোরামে 'মিজোরাম এগেনস্ট কোরাপশন', ন্যাগাল্যান্ডে 'নাগা কাউন্সিল', অরুণাচল প্রদেশে বিভিন্ন উপজাতি ছাত্র সংগঠন, শিলংয়ে বিশেষ করে নেহুর (নর্থ-ইস্ট হিস ইউনিভাসিটি) ছাত্র-ছাত্রীরা প্রচুর সভা সমাবেশ সংগঠিত করেচে। অসমে অবশ্যই অখিল গগৈর কেএমএসএস মুখ্য ভূমিকা নিয়েছে বোড়ো, কার্বির নিষিদ্ধ সংগঠনও আন্দোলনকে সমর্থন করেছে। কেজিরিওয়ালাদের নানা ছুতোয় যেভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে এতে স্পষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার বেসামাল। ভোটের জন্য টাকা কান্ডে অমর সিংয়ের গ্রেফতারি তাদের আরও কোণঠাসা করেছে। কার কিংবা কাদের উসকানিতে তিস্তা চুক্তির বিষয়ে এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে উপেক্ষা করা হয়েছে, তা পরিষ্কার। তিস্তা-কান্ড আন্তর্জাতিক স্তরেও কেন্দ্রীয় সরকারকে বে-আব্রু করে দিয়েছে।

কিছু নাক উঁচু বুদ্ধিজীবী রামলীলা ময়দানে হিন্দু ঘেঁষা গান, শ্লোগান ইত্যাদিতে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। 'বন্দেমাতরম' বা 'ভারতমাতা কি জয়' আওয়াজ তোলা উদ্বেগের নয়। যা উদ্বেগের তা হল সংঘ পরিবারের নিঃশব্দ প্রবেশ। রামলীলা ময়দানে আন্দোলনের পুরো পর্যায় জুড়ে শেহলা মাসুদের হত্যা নিয়ে একটি কথাও উচ্চারিত না হওয়া বিস্ময়কর। কারণটা কি এই যে মধ্যপ্রদেশ একটি বিজেপি শাসিত রাজ্য? কংগ্রেসি সরকারের দুর্নীতি বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে বিজেপির সঙ্গে সখ্য করা কড়াই থেকে সরাসরি আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার শামিল। কিন্তু মানুষ চাইলেই এতে উপস্থিতিকে উড়িয়ে দেওয়া যাবে না বা এদের এড়িয়েও থাকা যাবে না। এরা মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনে হিন্দু মহাসভা, জয়প্রকাশ নারায়ণের সময়েও জনসংঘ হিসাবে উপস্থিত ছিল। মিশরেও মুবারক-বিরোধী আন্দোলনে 'ইসলামিক ব্রাদার হুড' -এর উপস্থিতি শিরঃপীড়ার কারণ ছিল। এখনও সেখানে আন্দোলনের সুফলটা কে তুলবে তা নিয়ে টানাপোড়েন অব্যাহত। তাই বহু অ-পার্টি, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ যারা এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছেন এবং সমমনোভাবাপন্ন দল, সংগঠনগুলিই টিম আন্না যাতে গৈরিক বাহিনীর ক্রীড়নকে না পরিণত হয় তা নিশ্চিত করতে পারে।